বস্তুবাদের মুখোশ উন্মোচন

তাফাজ্জুল হক

ফাতিহ
প্রকাশন

সূচি

প্রথম অধ্যায়

- ইমান ও বস্তুবাদের লড়াই..... ১৩
- বস্তুবাদীদের দৃষ্টিতে সাহিত্য ১৬
- সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন স্বেচ্ছাচারের কারণ..... ১৮
- বাংলাসাহিত্য ও হুমায়ুন আজাদ ২১
- বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার সাধনা ২৪
- ধর্মবিরোধী সাহিত্যচর্চার ইতিহাস ২৮
- ১৯৭১ পর্যন্ত.....৩০
- ইংরেজির প্রসঙ্গ আসায় কিছু কথা বলা দরকার– ৩৮
- সাহিত্যে মোড় পরিবর্তনের কারণ.....৪৭
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা ৫৩
- বাংলাসাহিত্যে বস্তুবাদের প্রভাব ৬০
- মুনির চৌধুরী ও অন্যান্য.....৬৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

- হুমায়ুন আজাদ ৭২
- মুহম্মদ জাফর ইকবাল ৮২
- সংস্কৃতি সম্পর্কে বস্তুবাদীদের অবস্থান ৮৮
- হাসনাত আব্দুল হাই.....৯৪
- সেলিনা হোসেন ১০৫
- আমরা তার কল্পিত গল্প সম্পর্কে কয়েকটি কথা জানতে চাইব ১২২
  - তিনি বড়ো আকারে কয়েকটি অপরাধ করেছেন– ...১২৩
- আবুল হাসনাত..... ১২৬
- যোগাযোগের অভাব কি বিভাজনের কারণ?..... ১৩২
- সৈয়দ শামসুল হক..... ১৩৫
- তসলিমার সাহিত্য ১৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

- মাতৃভাষা ও ইসলাম ১৪৯
- রাষ্ট্র ও ধর্ম ১৫৩
- প্রাচ্যবাদ ও ইসলাম ১৫৭
- গুরুদক্ষিণা ১৬১
- পশ্চিমে বস্তুবাদের জন্মকথা..... ১৬৬
- ইতিহাসবিকৃতির দন্ত-নখর ও প্রজন্মের লড়াই ১৭২
- দাসত্বের মহিমা ১৭৫

ইমান ও বস্তুবাদের লড়াই

আমরা যদি বাস্তবতার চোখে বর্তমান পৃথিবীকে একটু নিরীক্ষণ করি, তা হলে দেখতে পাব, বর্তমান পৃথিবী দুটি চিন্তাধারার লালনকেন্দ্র; বরং যুদ্ধক্ষেত্র বা রণাঙ্গন বলাই যুক্তিযুক্ত। সেই দুটি চিন্তাধারা হচ্ছে ইমান ও বস্তুবাদ, যা মানবজাতিকে দু-ভাগ করে দিয়েছে—মুমিন ও কাফের।

এ দুটো চিন্তাধারা বর্তমান সমাজের লাগাম ধরে দুদিকে এমন জোরে টানছে যে, কোনো দিকের শক্তি যদি সামান্যতম হ্রাস পায়, তার অবস্থা নাজেহাল হয়ে যায়, আর অন্য দিক প্রাধান্য বিস্তার করে বসে।

পৃথিবীর যে যেখানেই থাকুক, এ-দুটির একটি তাকে গ্রহণ করতেই হয়। যারা ঘোষণা দিয়ে গ্রহণ করে না, তারাও নিজেদের অজান্তে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

কারণ ইমানের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, এগুলো থাকলে মানুষ মুমিন হতে পারে। আর তার বিপরীত অবস্থানে রয়েছে বস্তুবাদ। সেখানে ঢুকতে মাত্র একটা শর্ত– ইমানের অনুপস্থিতি। সুতরাং ইমানের অনুপস্থিতিই বস্তুবাদে ঢোকার সদর দরজা। ইমান না-থাকলে বস্তুবাদের দরজা অটো খুলে যায়।

পরিবার, সমাজ, দেশ ও মহাদেশ সব জায়গায় এ দ্বন্দ্ব চলমান। যেহেতু এটা চিন্তাগত দ্বন্দ্ব, মানুষকে ভেতর থেকে বদলে দেয়, তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রভাব ফেলে। ব্যক্তি-পরিবার-সমাজের প্রতিটি জায়গায় তা ছাপ রেখে যায়।

আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব– ভাষা ও সাহিত্য; এ মাঠও ইমান ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বের বড়ো একটা ক্ষেত্র। তবে বর্তমানে এ মাঠে বস্তুবাদের জয়জয়কার চলছে। সেখানে তাদের দাপট এত বেশি যে, দু-চারজন

১৯৭১ পর্যন্ত

১৯৭১ সাল, অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বপর্যন্ত বাংলাসাহিত্য-ভাবনায় তিনটি গ্রুপ ছিল। একদলের কথা ছিল– আমরা মুসলমান। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য হবে ইসলামি ভাবধারায়।

কথাটি যে তারা বলতে পেরেছিলেন, অথচ তাদের বেশিরভাগই আলেম ছিলেন না। সাধারণ শিক্ষিত হয়ে এমন কথা বলা, এমন মনোভাব পোষণ করা– পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত না-হওয়ার উজ্জ্বল প্রমাণ। আজ যারা সাহিত্যকে ধর্মমুক্ত দেখতে চান, তারা স্বীকার করুন বা না করুন, তাদের এ চিন্তা যে পাশ্চাত্য থেকে ধার করা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারত উপমহাদেশ কখনও ধর্মহীন চিন্তাধারা লালন করেনি। এখানে সর্বদা ধর্মের প্রভাব ছিল। উপমহাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ ছিল সব যুগে। এ দেশের সবকিছু চলত ধর্মকেন্দ্রিক। ভাষা ও সাহিত্য কখনও ধর্মের প্রভাবমুক্ত ছিল না। এ ছাড়াও বস্তুগতভাবে উপমহাদেশ তখন উন্নতির চূড়ায় ছিল।

এখানে কেউ বলতে পারেন, এগুলো কোনো সাহিত্যই ছিল না। সাহিত্য তো আমরা জন্ম দিলাম, পাশ্চাত্যের আলো-বাতাসে 'মানুষ' হওয়ার পর।

পরগাছাদের এমন কথার জবাবে আমরা বলব, বস্তুবাদও একটা ধর্ম। এ ধর্মের মাপকাঠিতে টিকলেই যদি সাহিত্য হয়, সেটাও একটা সম্প্রদায়ের রায়। যারা এ ধর্ম মানে না, তাদের ওপর এটা চাপানোর কারণ কী? তখন তো বলা উচিত, বস্তুবাদের দৃষ্টিতে সাহিত্য হলো– ...। কিন্তু এগুলোকে মানবজাতির সাহিত্য বলার মানে কী? বাঙালিদের সাহিত্য বলার অর্থ কী?

সাহিত্য জাতির মূল্যবান সম্পদ। এটা জাতির পরিচয় ও ঐতিহ্য বহন করে। পশ্চিমাদের আলো-বাতাস পেয়ে আমাদের সাহিত্য নিজস্বতা ও স্বকীয়তা

কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান-সাহিত্য হয় না। হিন্দু-সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ও হিন্দুজীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদিস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিমজীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করবে হিন্দুসমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিমসমাজ থেকে।'[১২]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথায় পরিষ্কারভাবে আমাদের সাহিত্যের রূপরেখা ফুটে উঠেছে। তখন তিনি ছিলেন সাহিত্য সভাগুলোর 'সভাপতি'। আর এখন বাংলা সাহিত্যিকদের কাছে তিনি 'মৌলবাদী' তকমা পাওয়ার যোগ্য!

পরগাছা যখন মাথা উঁচু করে, মূল গাছের পাতা তখন শুকাতে শুরু করে। তখন মৃত্যুই হয় তার শেষ পরিণতি।

আমাদের বাংলাসাহিত্যের একই দশা। কীভাবে যে পরগাছাগুলো গাছের জীবনটা হরণ করে নিল! আজ পুরোটা সমাজ সেই বিষাক্ত চিন্তাকেই সাহিত্যজগতের সংবিধান মনে করে!

এ তো গেল প্রথম দলের আলোচনা। তখন বাংলাসাহিত্য-চিন্তায় আরও দুটি গ্রুপ ছিল। এক দল ছিল এ ব্যাপারে নীরব। আরেক দল ছিল বর্তমান বস্তুবাদীদের পূর্বপুরুষ। তবে তারা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। তারা ধীরে ধীরে পশ্চিমা ভোগবাদীদের চিন্তাগত দাসত্ব গ্রহণ করছিল।

মুসলমানদের মধ্যে এই বিভাজন দেখা দেওয়ার মূল কারণ চিন্তাগত পরিবর্তন। তবে সেটাকে তথাকথিত উন্নতি বলা ভুল। মানুষ পার্থিব দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করতে পারে। একসময় তারা পায়ে হেঁটে সফর করত। তারপর উট-ঘোড়া, পালের জাহাজ, ইঞ্জিনের জাহাজ। তারপর এলো গাড়ি। এখন মানুষ দূরের সফর করে বিমানে। রকেটের মাধ্যমে মানুষ এখন চলে যায় চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহে।

চাঁদের দেশ জয় করে মঙ্গলগ্রহ পেরিয়ে এখন তারা আরও কিছুর অপেক্ষায় রয়েছে। এগুলো করতে হলে ধর্মবিরোধী হতে হবে, পরকালের কথা ভুলে যেতে হবে, সর্বোপরি চিন্তাগত দেউলিয়া হয়ে অন্যের চিন্তা গ্রহণ করতে হবে

১২. *প্রাগুক্ত*

বাংলাসাহিত্যে বস্তুবাদের প্রভাব

পৃথিবীর সকল ভাষার মতো আমাদের বাংলা ভাষাও বস্তুবাদের পথ ধরেছে। সমাজতন্ত্র হলো বস্তুবাদের একটা শাখা। বাংলাসাহিত্য বস্তুবাদী ইজমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে সমাজতন্ত্র দ্বারা। আমরা যদি বাংলাসাহিত্যের মোড় পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তা হলে দেখতে পাব, প্রথমদিককার বেশিরভাগ সাহিত্যিক সমাজতন্ত্রের দরজা দিয়েই বস্তুবাদে পৌঁছেছেন।

ইমানের মোকাবিলায় বস্তুবাদ এসেছে পশ্চিমাজগৎ থেকে। তারা ঐশী বিধান গ্রহণ না-করার ফলে এ পথ ধরেছে। তাদের অনুসরণ করা কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ নয়; বরং জ্ঞানীদের দায়িত্ব হলো তাদের ভুলগুলো ধরে দেওয়া। কিন্তু আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা তাদের চিন্তাকে চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে নেন। সেগুলোকে তাদের কলমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তারা মূলত বস্তুগত উন্নতি ও চিন্তাগত পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য করতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন। তারা মতবাদ গ্রহণ করে বসে আছেন। সেটাকে জোর করে প্রয়োগের চেষ্টা করছেন। আর দেখানোর সময় উদাহরণ দেন ওদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। অথচ পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্ব মতবাদগত; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নয়।

পদ্মা নদীর মাঝি মানিক বন্দোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। অনেক আগেই এটা সিনেমার পর্দায় এসে গেছে। স্কুলে সহপাঠ হিসাবেও পড়ানো হয়। আমার পরিচিত এক স্কুলছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, মানিক বাবুর এ উপন্যাসের মূল বার্তাটি কী? আমি পড়ার পর তার মনোভাবটা জানতে চাইলাম। সে বললো, 'মানিক এমন একটা সমাজের স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছেন, যেখানে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম আবার কেউ অন্য কোনো ধর্মানুসারী, এমন কোনো আলাদা পরিচয় থাকবে না। শুধু একটা পরিচয় থাকবে– সবাই মানুষ।'

মুনির চৌধুরী ও অন্যান্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এই পরিবর্তনের সময়কার যারা 'মহানায়ক', যারা এর পেছনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, পথ দেখিয়েছেন, তাদের একজন হলেন মুনির চৌধুরী। তার সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখছেন– 'বলা বাহুল্য, এসব কথাবার্তা যখন ঘটছিল, ১৯৪৭ সালে, তখন মুনির চৌধুরী প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েছেন বামপন্থী [বামপন্থি] রাজনীতির দিকে। তাঁর বাবা ছিলেন গোঁড়া মুসলমান, ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইএসসি পড়তে– কোন আশায় তা বুঝতে পারা যায় সহজে।

অগ্রজ কবীর চৌধুরীর কাছ থেকে জীবনের আধুনিকতার পাঠ নেওয়া সত্ত্বেও আলিগড়ে গিয়ে মুনির চৌধুরী বেশ বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যান; গায়ে পাথরের বোতাম লাগানো শেরওয়ানি, পায়ে চকচকে জুতো, মুখে পান, হাতে পাঞ্চাশ সিগারেটের টিন, বলায় চোস্ত উর্দু [উরদু]। আলিগড় থেকে ফিরে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে এবং সাহচর্য পেলেন রবি গুহ, দেবপ্রসাদ, সরদার ফজলুল করিম ও মদন বসাকের মতো সেরা ছাত্র ও উৎসর্গীকৃত কমিউনিস্টদের, তখন মুনির চৌধুরীর জীবনধারা গেল পাল্টে [পালটে]। বিলাসী জীবনকে মনে হল [হলো] মেকি এবং ব্যক্তির ও জনসাধারণের জীবনকে গভীরভাবে জানতে আর সমাজ পরিবর্তনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে সংকল্প করলেন তিনি। ...মুনির চৌধুরীর জীবনদৃষ্টির আধুনিকতা খানিকটা সাহিত্যপাঠজনিত, কিন্তু অনেকখানিই বামপন্থী [বামপন্থি] রাজনৈতিক দীক্ষাজনিত।'[২১]

২১. *স্মৃতির মানুষ*, *আনিসুজ্জামান*, ৩৪-৩৫

আমরা তার কল্পিত গল্প সম্পর্কে কয়েকটি কথা জানতে চাইব—

তিনি যে সমাজের ছবি তুলে ধরেছেন, সে সমাজ কোন কোন কারণে সমস্যায় জর্জরিত? সেটা কি ইসলামি সমাজ? সমস্যাগুলো কি ইসলামের কারণে তৈরি হয়েছে? সে সমাজে কি শুধু নারীরাই অসুবিধায়? সমস্যাগুলো কি নারীরা কাজের দায়িত্ব না-নেওয়ার কারণেই তৈরি হয়েছে? নারীরা কি তাদের অধিকার না-পাওয়ার কারণে এসব হচ্ছে, না-কি দায়িত্ব না-নেওয়ার কারণে?

ইসলাম কি তাদের সমস্যার সমাধান দেয়নি? ইসলামের দেওয়া সমাধান প্রয়োগ করেও কি নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে? নারী হিজাব পরলে নির্যাতিত আর উলঙ্গ থাকলে সুখী, উন্নত– এমন চিন্তা কি বাস্তব জীবনে পরীক্ষিত? সুন্দর ইসলামি সমাজে কি নারীদের ওপর নির্যাতনের কারণে গণহারে আত্মহত্যার ঘটনা হচ্ছে?

ইতিহাসের পাতায় ইসলাম পালনের কারণে কোনো নারী নির্যাতিত হওয়ার কোনো প্রমাণ আছে? নির্যাতিত হওয়া আর সুখময় জীবনের অধিকারী হওয়ার মাপকাঠি কী?

সেলিনা হোসেনরা যেটাকে সুখ বলবেন, সেটাই সুখ, তারা যেটাকে দুঃখ বলবেন সেটাই দুঃখ– এমন কিছুই সঠিক না-কি? তাদের কল্পিত জীবনই কি মুক্তির পথ? না আল্লাহর দেওয়া পথ মুক্তি ও সুখের পথ? তারা কোন নীতির ওপর নারীর মুক্তি আর সুখের ভিত্তি রেখেছেন?

লেখিকার এ লেখার উদ্দেশ্য কী? এগুলোর সমাধান তার লক্ষ্য, না সমস্যাগুলোকে কোনো ধর্ম ও জীবনব্যবস্থার দিকে সম্পৃক্ত করে বদনাম করা উদ্দেশ্য?

এজন্য দেখা যায়, পৃথিবীর বুকে কোনো ইসলামি রাষ্ট্র অস্তিত্বে আসাটা পশ্চিমারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। অথচ তারা নিজেরাই ইহুদিধর্ম-ভিত্তিক দখলদার রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করেছে। পাশাপাশি সেটাকে সবকিছু দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে।

এখানে এসে আমরা দেখি, সৈয়দ হক ইতিহাস ও বাস্তবতার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে পশ্চিমাদের মূল থিউরি প্রচার করছেন। সত্য বোঝার কাছেও যেতে পারছেন না। তিনি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়াতে ইরান, আফগানিস্তান ও ইসরাইলের সমালোচনা করছেন। অথচ ইসরাইল রাষ্ট্র তারাই প্রতিষ্ঠা করেছে, যারা আমাদের মাথায় ধর্মবিরোধী রাষ্ট্রের ভূত ঢুকিয়েছে। তিনি তো এখানে সমালোচনা করার কথা ছিল ব্রিটেন ও আমেরিকা-সহ পশ্চিমা প্রভু-রাষ্ট্রগুলোর। কারণ তারা ধর্মনিরপেক্ষ নামক ধর্মবিরোধী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পুরো প্রাচ্যের ঘরে আগুন লাগিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে নিজেরা জবরদখল করে ইহুদিদের জন্য ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। তাদের সুরক্ষার সকল দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছে।

ইউরোপ-আমেরিকা থেকে জাহাজ ও বিমানভরে অন্যদের ভূমিতে ইহুদিদের পাঠাচ্ছে। বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে স্থানীয়দের ঘরবাড়ি। হত্যা করছে নির্বিচারে। যুগের পর যুগ চালিয়ে যাচ্ছে এই অন্যায় অবিচার। এই তারাই আবার আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে আমাদের উসকে দিচ্ছে।

বস্তুবাদী সভ্যতা ও রাষ্ট্র পশ্চিমাদের বিষয়। আমরা ধর্ম ও ধর্মীয় রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী। সৈয়দ হক যে 'রাজনীতিতে মৌলবাদীদের প্রবেশ' দেখেছেন, এটা

তার ভুল। রাজনীতিতে মৌলবাদীরা নতুনভাবে 'প্রবেশ' করেনি। ইতিহাসে

কখনো সুলাইমান আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালাম, যুলকারনাইনকে দেখা গেছে সিংহাসনে, আবার কখনো ফেরআউন, নমরুদকে।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবু বকর, উমরের হাত ধরে, উমাইয়া, আব্বাসি, সেলজুকি, আইয়ুবি, মামলুক ও

ইতিহাসবিকৃতির দন্ত-নখর ও গ্রজন্মের লড়াই

বুঝে কী না-বুঝে জানি না, আমাদের দেশের 'কলম জাদুকরেরা' ইতিহাসের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেন। তারা ইতিহাসের দোহাই দিয়ে ইসলামকে সকল ভালো ও উন্নতির পথে বাধা হিসাবে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালান।

বিজ্ঞানের সাথে খ্রিষ্টধর্মের দ্বন্দ্ব হয়েছিল। তবে সেখানে অনেক ফাঁক-ফোকর আছে। ধর্মবিরোধী সেকুলারিস্টরা যেভাবে ইতিহাস বর্ণনা করে, বিষয়টি তেমন নয়। কারণ যেভাবে খ্রিষ্টধর্মের বিকৃতি তাদেরকে বিজ্ঞানের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিল, ওহির বিরোধী দর্শনও মানবজাতিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে কেটে দিয়েছিল। সুতরাং পশ্চিমা জগতে উভয় দলই অপরাধ করেছে। আজ সেই অপরাধের মাশুল দিতে হচ্ছে পুরো পৃথিবীবাসীকে।

ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। প্রকৃত বিজ্ঞান কখনও ইসলামের বিপরীত হওয়ার কথা নয়। মিথ্যা ও অপবিজ্ঞান বা তথাকথিত বিজ্ঞানবাদ নামক বস্তুবাদী ধর্মের সাথে ইসলামের বিরোধ বাঁধাটা স্বাভাবিক।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক ভুল হয়ে থাকে। সেগুলোও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের বিপরীত চলে যায়। আর যেহেতু বিজ্ঞান হলো শুধু বস্তুকেন্দ্রিক, তাই তার সীমার বাইরে কিছু সত্য বা মিথ্যা বলার অধিকার খাটাতে গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। তখন এটাকে ধর্মের ভুল না-বলে বিজ্ঞানের অনধিকারচর্চা বলতে হবে।

কিন্তু আফসোসের বিষয়– আমাদের দেশে যারা বিজ্ঞানের নামে তাবিজ বিক্রি করেন, তারা সেই ইতিহাস মুখস্থ করেন। ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান